পত্রালাপ

প্রসঙ্গ : জীবনতারা হালদার

তুলসীপ্রসাদ বাগচী

'নিবোধত'-র মার্চ-এপ্রিল ২০১৯ সংখ্যাটি হাতে পেলাম কয়েকদিন আগে। এর সব লেখাই ভাল লাগল, তবে বিশেষ করে মনে দাগ কাটল 'মনে পড়ে' বিভাগে সুদীপ সেনের লেখা 'এক স্মরণীয় বিপ্লবী : জীবনতারা হালদার' প্রবন্ধটি। প্রসঙ্গত কয়েকটি কথা বলার লোভ সামলাতে পারলাম না।

এই মহান মানুষটিকে দেখার বা প্রণাম করার সৌভাগ্য আমার হয়নি। কিন্তু আমার ছোট একটি স্মৃতি আছে। সেটা সম্ভবত ১৯৭৪ সাল। আমি তখন স্কুলের ছাত্র। বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর (১৮৯৪- ১৯৭৪) আশি বছর পূর্ণ হয়েছে। আর ওঁর ভুবনবিদিত 'বোস সংখ্যায়ন'-এর (Bose Statistics) পঞ্চাশ বছর পূর্তি হয়েছে। কলকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে এই উপলক্ষ্যে কয়েকটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেইরকম একটি অনুষ্ঠানে অধ্যাপক বসুকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁরা কে কী বলেছিলেন, তা এখন আর মনে নেই। কিন্তু একটি নাম কীভাবে যেন স্মৃতিপটে আঁকা হয়ে গেছে যা এই পরিণত বয়সেও ভুলতে পারিনি। বক্তার নামটি তেমন প্রচলিত নয়—জীবনতারা হালদার। তিনি কে তা তখন জানতাম না, বোঝার ক্ষমতাও ছিল না। কিন্তু তাঁর কৌতুকপূর্ণ বাচনভঙ্গিটি এখনও মনে আছে।

তিনি বলেছিলেন (স্মৃতি থেকে লিখছি, ভাষায় ভুল থাকতে পারে), ''আমি এঁর (বিজ্ঞানাচার্যের) বহুদিনের বন্ধু। আমার হাতে-তৈরি একটা বিশেষ আচার খেতে তিনি খুব ভালবাসেন। এটি তেঁতুল আর আদা দিয়ে তৈরি করি। উনি এর নাম রেখেছেন জিন-ট্যা (Gin-Ta)। জিঞ্জারের (Ginger) 'জিন' আর ট্যামারিন্ডের (Tamarind) 'ট্যা'—এই দুই মিলে এই অভিনব নামকরণ।''

সুদীপবাবু লিখেছেন, ''যে-কোনও বিষয় নিয়ে মুখে মুখে চমৎকার সব ছড়া তৈরি করার আশ্চর্য নৈপুণ্য ছিল তাঁর।'' এ-প্রসঙ্গে আমার একটি স্মৃতিধৃত নমুনা দিই। ওই 'জিন-ট্যা' নিয়েই এই ছড়াটি রসিক হালদার মহাশয় শুনিয়েছিলেন বেতার অনুষ্ঠানে—

''কত ভালবাসি তোমায়, তা বুঝলে তো, দাদা,
সারা বছর খাওয়াই কেবল তেঁতুল আর আদা।''

সামান্য জিনিস, তেঁতুল আর আদা! তারাও এই দুই মহাপুরুষের হাতে পড়ে কৌতুকে ঝলমল করে উঠল!

আর একটি কথা। শ্রী সেন লিখেছেন, 'অন্তত একবারের জন্যও যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন, তাঁরাই তাঁর মনোহর ঐন্দ্রজালিক ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়েছেন।' সবিনয়ে যোগ করতে চাই, এই 'মনোহর ঐন্দ্রজালিক ব্যক্তিত্ব' আসলে তাঁর সুগভীর আধ্যাত্মিক ক্ষমতার অতি সামান্য অংশের পার্থিব প্রকাশ মাত্র। সেযুগের অধিকাংশ বিপ্লবীই ছিলেন গুপ্ত সাধক। আর তাছাড়া, যাঁরাই দেশের জন্য, দশের জন্য নিজেদের জীবন পরিপূর্ণভাবে উৎসর্গ করেন, তাঁদের সকলের মধ্যেই এই আধ্যাত্মিক ক্ষমতার বিকাশ হয়। এ তো স্বামীজীর কথা, এর অন্যথা হতে পারে না। তাঁরা সেই অসীম আধ্যাত্মিক ক্ষমতা গোপন রেখে নিতান্ত সাধারণ মানুষের মতো বিচরণ করেন। আমরা তাঁদের ঠিকভাবে চিনতে পারি না। বড় জোর তাঁদের একজন ব্যতিক্রমী মানুষ বলে মনে করি। কিন্তু তাঁদের সান্নিধ্যে গেলে সেই প্রবল আধ্যাত্মিক শক্তির তরঙ্গ (সঠিক ভাষায়, 'তন্মাত্রা') আমাদের চেতনায় আঘাত করে। আমরা তা ঠিকমতো বুঝতে পারি না। শুধু হৃদয়ঙ্গম হয় ইনি আর পাঁচজনের মতো নন।

শ্রদ্ধেয় হালদার মহাশয়ের বিপুল আধ্যাত্মিক ক্ষমতার আর একটি অভ্রান্ত প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে লেখকের রচনার সূচনাতেই। লেখক 'চিরসতেজ, চিরসবুজ এই মানুষটির' শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে সবিস্ময়ে লিখেছেন, ''ছোটখাট চেহারার মানুষটিকে দেখে কে বলবে তখন তাঁর বয়স বিরানব্বই বছর! সেই বয়সেও একাকী ট্রামে-বাসে চড়ে কলকাতা শহরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ঘুরে বেড়াচ্ছেন। চোখের দৃষ্টি প্রখর, ছানি পড়ার কোনও লক্ষণ নেই, এমনকী চশমা ব্যবহার করতেও তাঁকে কোনওদিন দেখিনি।" আর, তাঁর মানসিক অবস্থা কেমন ছিল? তাঁর ''মনটা ছিল সহজ সরল অল্পবয়স্ক কিশোরের মতো। স্বভাবসুলভ অমায়িকতা আর কৌতুকপ্রিয়তার জন্য মানুষটি ছিলেন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবারই প্রিয়।" ভেবে দেখুন, আধ্যাত্মিকতার কোন উত্তুঙ্গ শিখরে আরোহণ করলে শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়েও একজন মানুষ নিজের শরীর আর মনের ওপর এতটা নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেন! যাঁরা মানুষের জন্য স্বেচ্ছায় সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারেন, তাঁরাই বোধকরি মরণ ভুলে অনন্ত প্রাণসাগরে এইরকম করে সদা-সর্বদা আনন্দে ভাসতে পারেন।

সুদীপবাবুর মহাভাগ্য, তিনি 'এক স্মরণীয় বিপ্লবী'-র ছদ্মবেশধারী এই মহান আধ্যাত্মিক সাধকটিকে দেখেছেন। শুধু তাই নয়, আম খেয়ে মুখটি মুছে বসে না থেকে আমাদেরও একটু ভাগ দিয়েছেন।

এই মহান সাধক-বিপ্লবীকে আমাদের প্রণাম জানাই। প্রার্থনা করি, তিনি যেন অমরলোক থেকে আমাদের আশীর্বাদ করেন। আমরা যেন এইসব মৃত্যুঞ্জয়ীদের আশীর্বাদে বর্তমান যুগের হতাশা আর সংকট কাটিয়ে উঠে তাঁদের স্বপ্নের ভারতবর্ষ গড়তে পারি।

নিবোধত কার্যালয়ের বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

গ্রাহকরা নবীকরণ না করলেও পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি (মে-জুন) পত্রিকা দপ্তরের ব্যয়েই সকলকে পাঠানো হয়। ১৫ জুনের মধ্যে নবীকরণ না করলে পরবর্তী সংখ্যা থেকে পত্রিকা পাঠানো সম্ভব হবে না।